এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

## আমাদের মনোবিজ্ঞানীরা

**জন মার্টিন**
মনোবিজ্ঞানী
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া

মনোবিজ্ঞানে আমার পড়তে আসা হঠাৎ কোন বিষয় নয়। আমাদের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি ছিল ভর্তি পরীক্ষা নয় বরং এইচ এস সি তে আমি কত নম্বর পেয়েছি সেটাই মূল মাপকাঠি। আমার স্কোর অনুযায়ী আমি দুটি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। মনোবিজ্ঞান ছিল তার মধ্যে একটি। তবে মনোবিজ্ঞান আদৌ পড়ব কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না। হঠাৎ একদিন এক বন্ধু বললো, 'চল সাইকোলজিতে ক্লাস করতে যাই'। হলোও তাই। আমি কয়েকদিন মনোবিজ্ঞানের ক্লাস করলাম। তারপর মনোবিজ্ঞানেই পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। কেউ কেউ নাক সিটকালো, কেউ কেউ অবাক হলো। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আমার সিদ্ধান্তটি সঠিক। কেন এই সিদ্ধান্ত নিলাম? আমার তখন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে ৫০০ কোটি মানুষের প্রত্যেকেই ভিন্ন। আলাদা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সবার। অতএব এই বিজ্ঞান না জানি কতো চ্যালেঞ্জিং হবে! মানুষের এই আশ্চর্য মন এবং মনন কে বোঝার জন্য শুরু করলাম আমার যাত্রা। চার বছরের পড়াশুনা শেষ করতে সময় লাগলো ৭ বছর। কি এক নেশায় লেগে থাকলাম। যেন এর শেষটি জানতে হবে, দেখতে হবে। এরশাদ ভ্যাকেশন, সেশন জট, কোন কিছুই আমাকে দমাতে পারলো না। আমার অনেক সহপাঠী আমাদের ছেড়ে অন্য পথ ধরলো। আমি আঁকড়ে থাকলাম মনোবিজ্ঞানকে। অনেকেই বলেছে মনোবিজ্ঞান পড়ে আমাকে নাকি অন্য কাজ করতে হবে। তার উদাহরনও ভুরি ভুরি রয়েছে। মনোবিজ্ঞান পড়ে ব্যাংকে চাকরি করা তো রীতিমত সেই সময় ভীষন আলোচিত বিষয় ছিল। আমি সব সময় ভাবতাম মনোবিজ্ঞান পড়ে ছেলেমেয়েরা অন্য পেশায় কেন কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর তখন জানা না থাকলেও এখন বোধহয় এর একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি। আমরা চার বছর যা পড়ি- বা যে ভাবে আমাদের পড়ানো হয় তা আমাদের মনোবিজ্ঞানী হিসাবে তৈরি করে না। বরং একজন সাধারন গ্র্যাজুয়েট করে তুলে। আর আমরা সেই সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে ঘুরে ফিরি একটা চাকরীর জন্য। এমন চাকরী খুঁজি (এবং পেয়েও যাই) যেখানে মনোবিজ্ঞানের গন্ধ নেই। তাহলে মনোবিজ্ঞান পড়া কেন? মনোবিজ্ঞান পড়ে যদি সেই জ্ঞান এবং দক্ষতা মানুষের কাজে না লাগাতে পারি তাহলে স্রেফ এই চার বছর কেন অযথা নষ্ট করা? এর উত্তর অনেকভাবে দেওয়া যায়। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে মনোবিজ্ঞান পড়তে এসে আমরা কেবল 'অন্যের মন' কে বোঝার চেষ্টা করেছি কিন্তু নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা শক্তি কে আবিষ্কার করিনি।

আমাদের মনোবিজ্ঞান বিভাগ কেবল মনোবিজ্ঞানী তৈরি করেছে (অবশ্য যারা মনোবিজ্ঞানে পাশ করেছেন তারা নিজেকে মনোবিজ্ঞানী ভাবেন কিনা জানিনা)। কিন্তু সেই জ্ঞান এবং দক্ষতা কাজে লাগানোর ক্ষেত্র তৈরি করেনি। আমাদের সময় একটি ছাত্র সংসদ ছিল। যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কলেজ পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানকে অর্ন্তভুক্ত করা। আমি তখনো আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম মনোবিজ্ঞানীদের যদি কোন কাজের জায়গা না থাকে তাহলে মানুষ কেন মনোবিজ্ঞান পড়বে? ক'টি ছোট্ট উদাহরন দেই। এখন বাংলাদেশে কত টিভি চ্যানেলের ছড়াছড়ি। এক সময় বিটিভি ছিল একমাত্র টিভি চ্যানেল। তখন কাজের এবং চাকরীর সুযোগ ছিল খুবই অল্প। কিন্ত এখন চ্যানেল আই, বাংলাভিশন, এটিএন সহ সব চ্যানেলে যখন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তখন সেই চাহিদা মেটাতে নতুন নতুন ইনস্টিটিউশন গড়ে উঠছে। ছেলেমেয়েরা এই নতুন প্রযুক্তি এবং শিল্পে ঝুঁকে পড়ছে। আমাদের এই ১৫ কোটি মানুষের দেশে কবে কখন মনোবিজ্ঞানের চাহিদা কম ছিল? তাহলে আমাদের দেশে মনোবিজ্ঞানীদের চাকরী মনোবিজ্ঞানী হিসাবে কেন হবে না? আমাদের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় এই বিষয়টিতে কখনও তেমনভাবে মনোযোগ দেননি। তারা কেবল মনোযোগ দিয়েছেন মনোবিজ্ঞান পড়াতে এবং গবেষনায়। ফলে যারা এই প্রক্রিয়া শেষে সেই দক্ষতা ব্যবহার করবে তার জন্য কোন ক্ষেত্র তৈরি করেননি। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হয় নি। ক্ষতি হয়েছে দেশের । গরীব দেশটি আরো গরীব হয়েছে অর্থে নয় জ্ঞানে। একদল দক্ষ কর্মী ক্রমান্বয়ে ক্ষয় করেছে তার জ্ঞান আর দক্ষতা। যোগ দিয়েছে সাধারন কাজে। তাহলে এই দক্ষ মানুষ গুলোকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব কার ছিল? মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের আবছা এবং হেয়ালী ভরা হালকা দৃষ্টি আর অজ্ঞানতাকে দূর করার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের মানে যারা মনোবিজ্ঞানকে পাঠ্য করেছি। আমার কাছে মনোবিজ্ঞান সবসময় মনে হয়েছে একটি শিল্প। গান, নাটক, নাচ যেমন একটি শিল্প- যে শিল্পের জন্য প্রচুর চর্চার প্রয়োজন হয় ঠিক মনোবিজ্ঞানীকেও মানুষের মন এবং মননের সাথে কাজ করার জন্য ক্রমাগত চর্চা করতে হয় এই শিল্পকে। একজন শিল্পী যখন খুব চমৎকার করে নাচ বা গান করেন মানুষ তখন তার গুণের প্রশংসা করেন। অর্থাৎ ভাল নাচ বা গান শিখলেই যথেষ্ট নয়। তা মানুষকে দেখাতে হবে। আরো সহজ ভাষায়- শুধু মনোবিজ্ঞান পড়লেই চলবে না- তা ব্যবহার করে মানুষকে দেখাতে হবে। তবেই না মানুষ জানবে মনোবিজ্ঞানীদের প্রয়োজনটা কি? আমাদের মনোবিজ্ঞান বিভাগ এই প্রচারনায় ভীষন কাঁচা। আমাদের প্রয়োজন এক দল উচ্ছল মার্কেটিং টিম । যারা চারদিকে প্রচারনা চালাবে। প্রতিটি মানুষ জীবনের কোন না কোন সময় এমন কিছু ঘটনার মুখোমুখি হয় তখন তার পক্ষে একা তা সামলে উঠা সম্ভব নয়। প্রয়োজন একটি সাহায্যের হাত। একজন মনোবিজ্ঞানী ভীষন যত্ন আর দক্ষতা দিয়ে সেই মানুষটিকে সাহায্য করতে পারে। এই সত্যটি ক'জন মানুষ জানে? আমি যখন বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির সদস্য হই তখন ভেবেছিলাম এই সমিতি বোধ হয় এই কাজটি করবে। উহু! হোল না । উনারা জগতের সবকিছু নিয়ে ব্যস্ত -কেবল এই মূল বিষয়টি তাদের নজর কাড়েনি। এই সমীকরনটি যে কেন তারা বুঝলেন না- যে একজন মনোবিজ্ঞানে পড়াশুনা করে যদি সেই বিষয়েই কাজ করতে না পারে তাহলে সে হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ তার কাছে মনোবিজ্ঞান সমিতির কোন মূল্য নেই।

অষ্ট্রেলিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির (এপিএস) একটি উদাহরন দেই। সব পাওয়ার এই দেশে প্রতিটি নাগরিকের একটি মেডিকেয়ার কার্ড আছে । এই যাদুর কার্ডের অনেক শক্তি। যে কোন অসুখের জন্য আমাদের প্রথমেই একজন জি.পি (জেনারেল প্র্যাকটিশনার- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে MBBS ডাক্তারের সম-পর্যায়) কাছে যেতে হয়। উনি প্রথমে দেখবেন এবং ঠিক করবেন আমাকে কি কি টেষ্ট করতে হবে বা আমাকে আদৌ কোন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে কিনা? এই জিপিকে দেখানো, মেডিকেল টেষ্ট করার সকল খরচ ঐ মেডিকেয়ার কার্ড বহন করবে। কিন্তু এই কার্ড দিয়ে কোন মনোবিজ্ঞানীর সাথে সেশন করা যাবে না। তার জন্য আমাকে মনোবিজ্ঞানীর নির্ধারিত ফিস দিতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটি (এপিএস) গত কয়েক বছর ধরে অষ্ট্রেলিয়ার সরকারের সাথে প্রচুর আলোচনা করেছে। এপিএস দেখিয়েছে যত রুগী জিপির কাছে আসে তার শতকরা ৮০ ভাগেরই আছে ডিপ্রেশান, এ্যাংজাইটি বা স্ট্রেস। অতএব এই বিশাল জন গোষ্ঠিকে সেবা দিতে পারে মনোবিজ্ঞানীরা। সরকার ২০০৫ সালে তাদের যুক্তি মেনে নিয়েছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে সারা অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতিটি মানুষ বছরে (১২+৬) মোট ১৮ টি সেশান একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছ থেকে নিতে পারবে এবং তার খরচ মেডিকেয়ার বহন করবে। অষ্ট্রেলিয়ার মনোবিজ্ঞানীদের জন্য এটা ছিল বিশাল বিজয়।। এপিএস সেই সাথে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে। প্রতি বছর প্রত্যেক মনোবিজ্ঞানীকে তাদের সদস্য পদ নবায়ন করতে হবে। আর নবায়নের প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রত্যেককে প্রতি বছর ন্যূনতম পক্ষে ১০০ পি ডি পয়েন্ট (প্রফেশনাল ডিভেলপমেন্ট) সংগ্রহ করতে হবে। এপিএস সারা বছর মনোবিজ্ঞানীদের জন্য নানা বিষয়ের উপর ট্রেনিং আয়োজন করে। এক একটি ট্রেনিং এর এক এক পিডি পয়েন্ট। একজন মনোবিজ্ঞানীকে চড়া ফিস দিয়ে ঐ সব ট্রেনিংএ যোগ

দিতে হয়। নতুবা বছর শেষে তার সদস্যপদ থাকবে না। আর সদস্যপদ না থাকলে-মেডিকেয়ার এর মাধ্যমে রুগী দেখা যাবে না। আমি অষ্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের তুলনা করছি না । শুধু বুঝাতে চাচ্ছি যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা কিভাবে পুরো চিত্রটি বদলে দিতে পারে। এপিএস-এর এই কাজটি একটি চমৎকার উদাহরন।

শুধুই কি সংগঠনের পরিকল্পনার অভাব নাকি আমাদেরও প্রত্যয়ের অভাব? নিজেকে মনোবিজ্ঞানী হিসাবে ঘোষনা দেয়ার মত সেই শক্তি কি আমরা চার বছরে অর্জন করি?

আমার ধারনা আমরা পড়ি-জানি-শুনি - কিন্তু বুঝিনা কি ভাবে কোথায় তা ব্যবহার করব? তাই এই ১৫ কোটি মানুষের দেশে একজন মনোবিজ্ঞানী হয়েও বুঝিনা আমাদের চারিপাশে কত ডিপ্রেশন, এ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, ট্রমা থেকে শুরু করে ঐ স্কিজোফ্রেনিক মানুষ ঘুরে ফিরছে! আমাদের জ্ঞান আর দক্ষতা নিয়ে আমাদের যতখানি 'কনফিডেন্ট' হওয়া উচিত ছিল আমরা বোধহয় ততখানি কনফিডেন্স অর্জন করতে পারিনি।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ সেই দীনতাকে অনেকখানি ঘুঁচিয়ে দিয়েছে। আমার জানামতে এই বিভাগের পদ্ধতি, সিলেবাস এবং ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন- একজনকে দক্ষ মনোবিজ্ঞানী হওয়ার প্রক্রিয়াকে আরো জোড়ালো করেছে। আর তাই এক এক জনের ভিতর মনোবিজ্ঞানের জন্য ভালোবাসা জন্মেছে। সেই কারণেই বোধ হয় ১৯৯৯ এর দিকে যখন মনোবিজ্ঞানীদের জন্য একটি মিলন ক্ষেত্র তৈরী করতে চাইলাম আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের এক ঝাঁক উচ্ছল তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রতি মাসে আমরা একবার করে সেভ দ্যা চিলড্রেনের অফিসে বসতাম। আমার লক্ষ্য ছিল একটি, মনোবিজ্ঞানের জন্য ভালবাসা তৈরি করা। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ঠিকই। আমরা একজন আরেকজনের উপর আস্থার জায়গাটি তৈরি করতে পেরেছিলাম। তাই CMHD (Centre for Mental Health and Development) ছিল আমাদের আস্থার ফসল। সম্প্রতি বাংলাদেশী মনোবিজ্ঞানীদের গ্রুপ ইমেইল নেটওয়ার্ক আবার একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

এই মুহূর্তে আমাদের যা ভাবা উচিত তা হলো- আসলে আমরা কী চাই? আমরা কি চাই এই যোগাযোগকে কেবল অভিজ্ঞতা বা তথ্য সহভাগিতা করার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করবো? এই দলের সদস্য কারা হবেন- তা ভীষন গুরুত্বপূর্ণ। একটি দলে যেমন কর্মীবাহিনী দরকার- তেমনি দরকার প্রফেশনাল, অভিজ্ঞ কিছু লোকের-যারা গাছে পানি দেবার মত সবুজ এই কর্মীবাহিনীকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিকল্পনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সম্ভবত এই দলে অধিকাংশই তরুণ প্রফেশনাল বা ছাত্র-ছাত্রী। একটি প্রফেশনাল বডি-শুধু তরুণদের দিয়ে দাঁড়াবে না। আমরা যদি চাই এই প্রফেশনাল বডি উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা, বিতর্ক করবে- তাহলে আমাদের প্রয়োজন দক্ষ, অভিজ্ঞ প্রফেশনালস। আর এই কাজগুলো দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ মনোবিজ্ঞানীদের পথ তৈরী করব। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখনো যদি মনোবিজ্ঞান বিভাগ রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি অথরিটি তৈরি না করে তবে দেখা যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হচ্ছে প্রাইভেট কোন সংস্থার কাছে। কারন এই সংস্থাগুলো strategic এবং influential।

আমি খুব বিস্মিত হই যখন দেখি কত সহজে কাউন্সেলিং শব্দটি যত্র তত্র ব্যবহার করা হয়। কাউন্সেলিং এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই এমন বিষয়ের উপর পড়াশুনা করে অনেকেই নিজেকে কাউন্সেলার দাবি করছে। প্রতিবাদ করার কেউ নেই। আমাদের যা করার কথা ছিল আমরা তা করিনি। যারা মনোবিজ্ঞান চর্চা করছে তাদের কি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট-এর কোন শর্ত আছে? নাকি ১০-২০ বছর আগে যা পড়েছি সেই জ্ঞান দিয়েই এখনো সেবা দিয়ে যাচ্ছি? এই সেবার গুনগত মান কে পরীক্ষা করবে?

১৫ কোটি মানুষ যেখানে প্রতিদিন এক অসম্ভব কঠিন সময় পার করে জীবন যাপন করে সেখানে ১৫ লক্ষ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যার দরকার নেই- এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। একজন মানুষকে মানসিক ভাবে অসুস্থ করার যত রকম উপায় রয়েছে বাংলাদেশে তার প্রতিটি কারন ভীষন প্রকট এবং তার প্রভাব এই ১৫ কোটি মানুষের উপরই পড়ছে। তাহলে মানুষ চিকিৎসার জন্য আগ্রহী নয় কেন? একটি কথা আমাদের সময় প্রচলিত ছিল-গরীবের আবার দঃখ কি? অর্থাৎ গরীবের যেন দুঃখ পেতে নেই। হতাশ হতে নেই। আমার মনে হয় মানুষের যে একজন মনোবিজ্ঞানীর সাহায্যের দরকার -তা জনপ্রিয় করতে হলে প্রথমে টার্গেট করা উচিত ধনীদের। ঠিক যেভাবে মোবাইল কোম্পানীগুলো দশ বছর আগে শুরু করেছিল ধনীদের দিয়ে এবং এখন তা এসে গেছে সাধারন মানুষের হাতে। মনোবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য এটা একটা স্ট্র্যাটেজি হতে পারে।

এই মুহূর্তে একটি টিম দরকার যেখানে থাকবে অভিজ্ঞ প্রফেশনাল-এবং তাদের প্রথম কাজ হবে মনো-বিজ্ঞানীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা। অনেক ভাবেই সে কাজ করা যেতে পারে। ঢাকার বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুল এবং ইউনিভার্সিটিতে, বিভিন্ন এনজিওদের সাথে কথা বলে মনোবিজ্ঞানীদের কাজের সুযোগ করা যেতে পারে। শুধু মনোবিজ্ঞানীদের জন্য কাজের জায়গা

তৈরি করলেই চলবেনা- প্রয়োজন কনফিডেন্ট, দক্ষ মনোবিজ্ঞানী। সেই দ্বায়িত্বটা আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় গুলো নিতে পারে। আমি জানি আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, রয়েছে মতের অমিল। সবাই যদি অন্তত একটি বিষয়ে একমত হই যে এই মুহূর্তে আমাদের অস্তিত্বের কারনেই আমাদের একটি রেজিস্ট্রেশন বোর্ড তৈরি করা উচিত। আমি নিশ্চিত খুব শীঘ্র প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসবে আরো এক ঝাঁক মনোবিজ্ঞানী যারা বেশ দাপটের সাথেই মাঠ দখল করে রাখবে। আমাদের উচিত তাদের জন্যও একটি ক্ষেত্র তৈরি তরে রাখা। তাতে সুবিধা এই আমরা দলে ভারী হবো 'প্রফেশনাল' হিসাবে, 'অপোনেন্ট' হিসাবে নয়।

আমার এই লেখাটি পড়ে অনেকেই হয়তো বলবেন বিদেশে বসে এমন বড় বড় কথা সবাই বলতে পারেন। আমি সব অভিযোগ মাথা পেতে নিব। কিন্তু মানুষের কিছু সীমাবদ্ধতা তো থাকে। ধরুন এটাও আমার সীমাবদ্ধতা যে আপনাদের সাথে একই জায়গায় থেকে কাজ করতে পারছি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মনেবিজ্ঞানীর সাথে আমার একটি আত্মার সম্পর্ক আছে। নাহলে 'গ্রিফিত' নামের অষ্ট্রেলিয়ার কোন মফস্বল শহরে এ্যাবরিজিন্যালদের সাথে প্যারেনটিং এর ট্রেনিং মডিউল তৈরী করতে এসে, গভীর রাতে হোটেলে বসে, প্লেনে উড়তে উড়তে এই লেখাটি লিখবো কেন? আমরা যারা প্রবাসী হয়েছি তারা স্বেচ্ছায় জেনে শুনে নিজেদের স্বত্ত্বাকে দ্বিখন্ডিত করেছি। অভিবাসন খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। বিশেষ করে দেশের সাথে যাদের নাড়ীর সম্পর্ক বট গাছের শিকড়ের মত, তারা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রতিদিন বসবাস করেন। মনের এক খন্ডে বসবাস প্রবাসের আয়েস, স্বাচ্ছন্দ্য- আর অন্য খণ্ডে বসবাস -ফেলে আসা স্মৃতি আর আবেগের উত্তাল ঢেউ। তাই এই প্রবাসে বসেও সারাক্ষন খুঁজি আমার ফেলে আসা বাংলায় ভাল কিছু হলো কিনা। যে দেশে জন্মেছি, যে দেশের আলো বাতাসে বড় হয়েছি- সে দেশের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা ভুলি কি করে? আর সেই টান এবং মনোবিজ্ঞানের প্রতি নিছক ভালোবাসা থেকেই এই লেখা। বাংলাদেশে মনোবিজ্ঞানীরা কাজ করার সুযোগ পাক এটাই প্রত্যাশা।

**পুনশ্চঃ**

১. EMDR গ্রুপ এবং CMHD তৈরির সময় যারা তাদের শ্রম এবং সময় দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি জীবন কৃতজ্ঞ। এই দলটি যতগুলো ভালো কাজ করেছে তা কেবলই সম্ভব হয়েছিল মনোবিজ্ঞানের প্রতি আপনাদের ভালোবাসার কারনে। আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি তরুণ মনোবিজ্ঞানীরাই আমাদের দীনতা ঘুচিয়ে মনোবিজ্ঞানকে একটি প্রফেশনাল আন্দোলনে পরিনত করবে। ওরা নেতৃত্ব দিবে আর আমরা ওদের কর্মী হবো।